OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 551 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 551 - 560
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

স্বামী বিবেকানন্দের ‘মহাভারত’ : প্রাচীন ভারতের জীবনচর্যা এবং প্রজ্ঞার স্বরূপ সন্ধান ও আধুনিক বিচ্ছুরণ

ড. সিদ্ধার্থ খাঁড়া
সহকারী অধ্যাপক (W.B.E.S), বাংলা বিভাগ
আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল কলেজ, কোচবিহার
Email ID: Siddhartha.khanra4@gmail.com
0009-0009-1098-9784

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Ancient India, Hindutva, ancient civilization, ancient society, ancient culture, warfare, Indian philosophy, Kshatriya code, Mahabharata.

Abstract
The Mahabharata is the largest epic in the world. It serves as an authentic record of the educational, martial, and ethical principles of the Hindus of ancient India. Swamiji highlighted the significance of the Mahabharata for all Indians in his address titled ‘Mahabharata’ (1919), a topic central to my discussion. The narrative of the Mahabharata encapsulates a realistic portrayal of ancient India; the society, literature, culture, and domestic ethics of that era are reflected within its stories—aspects clearly perceived by Swamiji. This analysis is explored in the main essay. The epic encompasses everything from statecraft to imperial expansion. Furthermore, India's profound philosophy of life and historical details have shaped the very fabric of the Mahabharata, forming the subject of my discussion. My analysis also covers the martial strategies and archery skills of the Kshatriyas, alongside the power of mantras and meditation depicted in the epic. Swamiji describes how the culture and traditions of ancient Indian society and civilization have radiated into and influenced modern India—a theme central to my discussion. The essay also explores how Swamiji discovered the essence of ancient Indian life and wisdom within the Mahabharata. It sheds light on the renunciation, valor, and heroism of ancient kings, as well as the customs surrounding marriage. The Mahabharata delineates the distinct natures and characteristics of both Kshatriyas and Brahmanas—distinctions Swamiji articulated clearly in his address. These insights and their underlying themes constitute a crucial part of the analysis presented here.

Discussion

১৯০০ সালে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার পাসাডেনায় স্বামী বিবেকানন্দ একটি বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের শিরোনাম ‘মহাভারত’, এই ইংরেজি বক্তব্যটি ১৯০০ সালেই প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে স্বামীজির মৃত্যুর পর ১৯৯৩

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 551 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তে স্বামী 'বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার' চতুর্থ খণ্ডে এবং 'বিবেকানন্দ সমগ্র' এর অন্তর্ভুক্ত হয় এই বক্তব্যটি। যে বক্তব্যের বিষয় হল মহাভারত। প্রাচীনতম এই মহাকাব্যে প্রাচীন ভারতের হিন্দুদের শিক্ষানীতি, যুদ্ধনীতি ও ন্যায়নীতি প্রতিফলিত হয়েছে। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মহাভারতের মধ্যে প্রাচীন ভারতের সমাজ ও গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ দিকটি ফুটে উঠেছে। স্বামীজী আধুনিক তথা বর্তমান ভারতের নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে মহাভারতের জীবনশৈলীকে অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ ও দ্রৌপদী তার লেখনীতে নবভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আধুনিক সময় ও আধুনিক মানুষ মহাভারতের সময়কে নতুন করে ফিরে দেখার অবকাশ পেয়েছে বিবেকানন্দের এই ভাষণ তথা প্রবন্ধের মননশীল পাঠে। মহাভারতের জীবনবৃত্তে আধুনিক মানুষ নিজের ভাঙা-গড়ার জীবনপ্রবাহকে প্রতিবিম্বিত ও আভাসিত হতে দেখেছে স্বামী বিবেকানন্দের এই সরল ও প্রাণবন্ত বক্তব্যের কারণে।

মহাভারতের কাহিনি ও চরিত্রের অন্তরালে প্রাচীন ভারতের গভীর জীবনদর্শনের তত্ত্ব ও বহু ঐতিহাসিক তথ্য সঞ্চিত রয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার পাসাডেনার শেক্সপীয়ার ক্লাবে বিবেকানন্দের প্রদত্ত ভাষণ তথা 'মহাভারত' নামাঙ্কিত প্রবন্ধের মধ্যে সেই অনালোকিত দিকটি উন্মোচিত হয়ে উঠেছে। মহাভারতের কাহিনি বলতে বলতে বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধনীতি, রাজ্যশাসন, সাম্রাজ্য বিস্তারের কৌশল, হিন্দু রাজাদের মানসিক শক্তির বিভিন্ন দিক ব্যক্ত করেছেন। প্রাচীন ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রনীতি প্রতিফলিত হয়েছে তার এই ভাষণের মধ্যে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার সূত্রে প্রাচীন ভারতের হিন্দুদের বিবাহ প্রথা, নারীর বহুপতিত্ব আর সেই প্রসঙ্গে উঠে আসা অস্ত্র কৌশলের প্রদর্শন চিত্রিত হয়েছে সুন্দরভাবে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রদের মধ্যে জাতিগতভাবে যে পার্থক্য আছে তা এই প্রবন্ধের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে লক্ষ্যভেদ প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ কতখানি তার পরিচয় দিয়েছেন বিবেকানন্দ তাঁর এই প্রবন্ধে। প্রেমের আখ্যান হিসেবে সাবিত্রী-সত্যবানের গল্পকথাকে শুনিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্দরে প্রাচীন ভারতের বীর ক্ষত্রিয়দের আচার, ব্যবহার ও নীতি কীরূপ ছিল তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। অস্ত্রবিদ্যার মধ্যে মন্ত্রশক্তি ও ধ্যানশক্তির অনুশীলন হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজারা কীভাবে করতেন তার ছবি রয়েছে এই ভাষণের কথনশৈলীতে।

মহাভারতের কৌরব ও পাণ্ডবরা যে শকুন্তলার পুত্র ভরতের বংশধর তা একদম শুরুতেই বিবেকানন্দ স্পষ্ট করেছেন এবং এই ভরতের নামানুসারেই যে এদেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে তাও তিনি ব্যক্ত করেছেন। মহাভারত এই নামের মধ্যেই দেশ হিসেবে ভারতবর্ষের নামকরণের কারণ নিহিত। মহাভারতের চারিত্রিক গুণাবলীর দিকে লক্ষ্য রেখেই দেশের নাম হয়েছে ভারতবর্ষ। মহাভারত ও ভারতবর্ষের মধ্যে রয়েছে অভেদ সম্পর্ক। ভারতের যা মানবধর্ম এবং সমাজধর্ম মহাভারতেরও সেই একই ধর্মের সমীকরন। তাই মহাভারতের কাহিনি পড়লে গোটা ভারতবর্ষকে জানা সম্ভব ও বোঝা সম্ভব। মহাভারতের কাহিনিতে আদর্শ চরিত্রের মূল্যবোধ ভারতবর্ষের জাতিসত্তার মূল্যবোধকে তুলে ধরে। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের উক্তি –

> "মহা অর্থে শ্রেষ্ঠ এবং ভারত অর্থে রাজা ভরতের বংশধরগণ, মহাভারত শব্দের দ্বারা বোঝায় দেশশ্রেষ্ঠ ভারত অথবা রাজা ভরতের মহান বংশবতংসগণের জীবন কাহিনী।"[১]

স্বামীজি আরো বলেন যে গ্রীকরা যেভাবে হোমারের কাব্যকে সম্ভ্রম ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখেন ভারতীয়রাও তেমনি একইভাবে মহাভারতকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং এই কাব্যকে নিজের আত্মার খুব কাছাকাছি বলে অনুভব করেন। ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক চেতনার সূচনা ও বিকাশ এই মহাভারতের হাত ধরেই সম্ভব হয়েছে।

যুগান্তরের ক্রমিক পরম্পরায় এই মহাকাব্যের মধ্যে অসংখ্য কাহিনি, উপকথা, পুরাণকথা দার্শনিক তত্ত্ব ও ইতিহাসের বিভিন্ন অংশের বহু বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে এবং সেই কারণে লক্ষাধিক শ্লোক নিয়ে মহাভারত নিজের কায়াকে নির্মাণ করেছে। পাণ্ডব ও কৌরবের আধিপত্যের সংঘাত আসলে আর্যদের শক্তিশালী জাতিরূপে বিস্তার লাভের একটি উপায়মাত্র একথা জানিয়েছেন স্বামীজি। তার মতে আর্যরা ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে আসে তারপর ভূখণ্ডের অবিসম্বাদী শাসকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। কৌরব ও পাণ্ডব সেই আর্যদের দুটি বিরোধী শাখা যাদের মধ্যে লড়াই ছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 551 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মহাভারতের কয়েকটি কাহিনি স্বামীজী মূল্যায়ন করেছেন তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। কাহিনি বলেছেন নিজস্ব স্বতন্ত্র ভঙ্গীতে। তাদের মধ্যে একটি হল বারণাবতে জতুগৃহ অংশটি। ধৃতরাষ্ট্রের সৎভাই বিদুরের সাহায্যে জতুগৃহ থেকে পালিয়ে ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে এই ক্ষত্রিয় পঞ্চপাণ্ডব ভিক্ষান্নের দ্বারা দিন কাটাতেন তার বিবরণ মহাভারতেও আমরা পেয়ে থাকি। মানসিক শক্তি ও দুর্জয় সাহসকে অবলম্বন করে পাণ্ডবরা সেদিন অরণ্যের ভীতিকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হল প্রাচীনকালে ভারতের একবিশেষ বিবাহের রীতি। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা প্রসঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের বিচিত্র বিবাহ প্রথার রীতিকে টেনেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন –

> "এ প্রথানুযায়ী প্রাচীনকালে কোনো রাজকুমারী নিজেই নিজের স্বামী নির্বাচন করতে পারেন। রাজকুমার এবং রাজপুরুষদের বিরাট এক সমাবেশের মধ্য থেকে রাজকুমারী তার স্বামী নির্বাচন করে নিতেন। শিঙাবাদক ও ঘোষকদের সামনে রেখে বরমাল্য হস্তে তিনি সভামধ্যে এগোতে থাকতেন। পাণিপ্রার্থীদের প্রত্যেকের সামনে এসে ঘোষকরা একটু থেমে প্রার্থীর গুণাগুণ ও বীরত্ব কাহিনী বর্ণনা করত। তারপর সব বর্ণনা বিচার করে রাজকুমারী যখন মনস্থির করতেন যে কোন রাজকুমার অথবা রাজপুরুষকে স্বামীরূপে বরণ করবেন তখন স্বহস্তধৃত ফুলহারটি মনোনীত জনের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। এরপরই শুরু হয়ে যেত বিবাহোৎসব।"[২]

স্বয়ম্বর সভাগুলিতে অস্ত্রকৌশল অথবা শক্তিপরীক্ষার প্রতিযোগিতা হত। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় জয়ী ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ হত রাজকুমারী প্রাপ্তির অন্যতম ভাগীদার। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ক্ষত্রিয়কে জয়ী করার জন্য অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়ার রীতি প্রাচীনকালের সমাজেই ছিল। প্রাবন্ধিক প্রতিভা বসু 'মহাভারতের মহারণ্যে' দ্রৌপদীর স্বয়ংম্বর সভার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রাচীন ভারতের অন্যায় ও নৃশংসতার উদাহরন টেনেছেন। তার মতে –

> "মহাভারতের প্রথম অনায় ও নৃশংসতার লীলাটি হল দ্রৌপদীর প্রকৃত স্বামী অর্জুন হলেও তাঁকে বিবাহ করতে হলো পাঁচজনকেই। স্বয়ংম্বর সভায় মাল্যদান মানেই বিবাহ, পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে পাত্রী যাঁকে মাল্যদান করবেন তিনিই হবেন তাঁর পতি। মাল্যদান করেই শকুন্তলা দুষ্মন্তকে বিবাহ করেছিলেন। মাল্যদান করেই কুন্তী পাণ্ডুর পত্নী হয়েছিলেন। বেচারা দ্রৌপদী! যাকে মাল্যদান করলেন, তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতাও যে একজন মস্ত দাবিদার হয়ে তাঁর শয্যায় এসে উপস্থিত হবেন, তা কি তিনি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন কখনো!"[৩]

আর্যদের এই অন্যায় বিবাহের রীতি প্রাচীন ভারতীয় সমাজচিত্রকে তুলে ধরেছে।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় পঞ্চপাণ্ডবদের ব্রাহ্মণরূপে ছদ্মবেশ ধারণের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে স্বামীজী ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে লক্ষ্যভেদ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। তেমনি তাদের কর্তব্য ও কর্ম সম্বন্ধে সুনিশ্চিত তথ্য দিয়েছেন। জাতিগতভাবে ব্রাহ্মণরা সাধারণত স্বল্পভাষী ও মৃদুস্বভাবযুক্ত। বিধি অনুসারে তাদের মারাত্মক অস্ত্র স্পর্শ করাও উচিত নয়। এমনকি তরবারিও ধারণ করা যায় না। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য –

> "ধ্যান-জপ অধ্যয়ন এবং অন্তঃ প্রকৃতিকে জয় করার সাধনাই হল ব্রাহ্মণের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।"[৪]

অথচ অর্জুন এগুলোর কোনটাই না মেনে ধনুকে শর যোজনা করে লক্ষ্যভেদ করেছেন এবং দ্রৌপদীকে লাভ করেন। ধীরস্থির প্রকৃতির ব্রাহ্মণ হিসেবে অর্জুনকে মহাভারতে দেখা যায়নি। সে বীর্যবান পুরুষ। তার বীরত্ব ক্রোধের কারণ ক্ষত্রিয়দের কাছে। অবলীলায় ধনুর্বাণ তুলে নিয়ে অক্লেশে তাতে ছিলা পরিয়ে শরযোজনা করে মাছের চক্ষু বিদ্ধ করেন অর্জুন।

দ্রৌপদীকে সমানভাবে ভাগ করে নেবার ক্ষেত্রে বহুপতিত্ব এবং মাতৃ আদেশের সামাজিক প্রসঙ্গটি উঠে আসে। এই অদ্ভূত বিবাহপ্রথার অন্তরালে আছে কুন্তীর সম বন্টনের রাজনীতি এবং মাতৃ আদেশ। যাতে বৈষম্য না আসে সন্তানদের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে মহাভারতে কুন্তীর সেই উক্তি –

> "যা এনেছ সমানভাবে ভাগ করে নাও বাবা।"[৫]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 551 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মায়ের এই আদেশ রক্ষা করা প্রাচীন ভারতের একটি বিশেষ বিধি ও রীতি। মাকে মিথ্যে বাক্যের জন্য দায়ী করা ভারতবর্ষে নীতিবিরুদ্ধ একটি কাজ। তাই মা কোনদিন মিথ্যা বলতে পারে না। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন –

> "এক যুগে সমাজের মধ্যে নারীর বহুপতিত্ব প্রথার প্রচলন ছিল এবং তদনুযায়ী একই পরিবারের ভ্রাতৃবন্ধু একই নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতেও পারত।"[৬]

মাতৃ আদেশের এই পরম্পরা ও প্রত্যয় থেকেই মায়ের প্রতি প্রাচীন ভারতের ভক্তি ও শ্রদ্ধা ব্যক্ত হয়েছে।

প্রেমের কাছে মৃত্যু কীভাবে পরাজয় স্বীকার করেছে তার আদর্শ যুক্তি টানতে গিয়ে বিবেকানন্দ সাবিত্রী সত্যবানের আখ্যানকে তুলে ধরেছেন। সাবিত্রী তার মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে যে পরিমান আস্থা ও ভরসা রেখেছে তা সত্যিই ব্যতিক্রমী এবং মৌলিক। শ্বশুরের অন্ধত্ব এবং ঋতরাজ্য ফিরিয়ে নিয়ে আসার সংকল্পে সাবিত্রীর যুক্তি যথেষ্ট মানবিক এবং গ্রহণযোগ্য। স্বামীর সাথেই সে নরকে যেতে প্রস্তুত হয়েছে তবুও সে মৃত স্বামীকে ছাড়তে নারাজ। যম তার একনিষ্ঠ প্রেমের কাছে হার মেনেছেন। মৃত্যুঞ্জয়ী সাবিত্রীর প্রেম। বিবেকানন্দের কলমে ব্যক্ত সাবিত্রীর উক্তি যমের প্রতি –

> "দেব স্বামীর অনুগমনেই আমার আনন্দ। জীবন অথবা মৃত্যু স্বর্গ অথবা নরক, যেখানেই হোক না কেন সেখানেই আমাকে যেতে হবে।"[৭]

মৃত প্রেমিক স্বামীর থেকে সে কখোনই সরে আসেনি। পিতৃত্ব পর্যন্ত স্বামীকে বাঁচিয়ে রাখার যে প্রতিশ্রুতি সে অর্জন করেছিল তা সকলের কাছে বিস্ময়কর। তার প্রেমের গভীরতা ও অসীম শক্তির কাছে যমরাজের অনিবার্য মৃত্যুচেতনাও ম্লান হয়ে গেছে। বিবেকানন্দ বলতে চেয়েছেন ভারতীয় নারীরা যেন তাদের স্বামীকে এভাবে সাবিত্রীর মতোই গভীরভাবে ভালোবাসে। যে ভালোবাসায় স্বামীর কল্যাণ সূচিত হবে। এছাড়া সমস্ত বিপদ থেকে স্বামীকে বাঁচাতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে। মৃত্যুর পরও স্বামীর ভালোবাসা যেন সেই নারীকে আজীবন বাঁচিয়ে রাখতে পারে। মৃত্যুর হাত থেকে স্বামীকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসার সংকল্পে ও ভীষণ জেদ তাদের অসীম ক্ষমতাকে চিরদিন ব্যক্ত করবে। বিবেকানন্দ ভারতীয় নারীর প্রতি সেই বিশ্বাস রেখেছেন তাই তার উক্তি –

> "ভারতের প্রতিটি বালিকারই কাম্য তারা সাবিত্রীর মত হবে, সাবিত্রীর মতই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের অধিকারিণী হয়ে স্বামীর আত্মাকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে।"[৮]

স্বামীর মঙ্গল-অমঙ্গলে স্ত্রীর এই আত্মবলিদান ও অবদান ভারতীয় নারীর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও অনন্ত প্রত্যয়কে ব্যক্ত করে।

যুধিষ্ঠিরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনির অন্তরালে খুঁজেছেন বিবেকানন্দ। বনবাস জীবনে তৃষ্ণায় অধীর হয়ে মৃত চার ভাইকে দেখেও ধৈর্য না হারিয়েও বকরূপী ধর্মের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যুধিষ্ঠির। ব্যক্তিগত লাভ ও সুখের থেকে যুধিষ্ঠিরের কাছে অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে হয়েছে। তাই বিবেকানন্দ যুধিষ্ঠিরকে দার্শনিক ও যোগী বলেছেন। বারো বছর বনবাস ও একবছর অজ্ঞাতবাসের সমাপ্ত হলে ন্যায্য অধিকারের দাবিতে শেষপর্যন্ত শান্তি স্থাপনের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হল। একপক্ষে দুর্যোধন আর অন্যপক্ষে যুধিষ্ঠির। এই যুদ্ধের মধ্যে বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয়দের আচার ও ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেছেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভারতের প্রাচীনযুগের যুদ্ধনীতি লক্ষ্য করা গেছে। বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করেছেন সারাদিন যুদ্ধের পর যোদ্ধারা সন্ধ্যা বেলায় শত্রু ও মিত্র পক্ষ উভয়েই বন্ধুর মতো আচরণ করত। উভয়ের শিবিরে উভয়ের যাতায়াত ছিল অবাধ ও শান্তিপূর্ণ। মুসলমান আক্রমণের পুর্ব পর্যন্ত এমন অদ্ভূত যুদ্ধনীতি প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে 'মহাভারত' প্রবন্ধে বিবেকানন্দের বক্তব্য –

> "সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল এই যে সে যুগের যুদ্ধনীতির মধ্যে সারাটা দিন তুমুল যুদ্ধের পর সন্ধ্যায় যখন যুদ্ধবিরতি হয় তখন উভই পক্ষই পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করত, উভয়েই উভয়ের শিবিরে গমনাগমন করত। কিন্তু প্রত্যুষের আগমন হলেই আবার তাঁরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ত। হিন্দুদের এই অদ্ভূত যুদ্ধনীতি প্রচলিত ছিল মুসলমান আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত।"[৯]

বিবেকানন্দের মতে এছাড়া ক্ষত্রিয় যুদ্ধনীতির আরো কিছু নিয়ম ও নীতি ছিল। যেমন কোনো অশ্বারোহী যোদ্ধা কখনো কোনো পদাতিক যোদ্ধাকে বিনা কারণে আক্রমণ করবে না। অস্ত্র ফলকে কেউ বিষ মাখাবে না। অসম যুদ্ধে কেউ শত্রু

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 551 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নিধন করবে না। কোনো অসৎ উপায় অবলম্বন করবে না। মধ্য এশিয়া থেকে আসা বিদেশী আক্রমণকারীদের যুদ্ধে পরাস্ত করার পর তাদের উপহার সমেত স্বদেশে পাঠিয়ে দিত হিন্দু রাজা এবং যোদ্ধারা। ক্ষত্রিয় রাজাদের যুদ্ধনীতিতে ছিল পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের যোগ। হিন্দু রাজারা যুদ্ধে জয়ী হলে পরাজিত রাজার অধিকৃত রাজ্য অধিকার বা দখল করতেন না এবং রাজাকে হত্যাও করতেন না বরং মর্যাদা সহকারে পরাজিত রাজাকে স্বদেশে ফেরত পাঠাতেন। এই নৈতিক আদর্শ ও মূল্যবোধ মুসলমান বিজেতা রাজারা কখনো দেখাতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন –

> "হিন্দু যুদ্ধনীতিতে একথাও বলা হয়েছে যে কেউ কারো দেশ অধিকার করে নেবে না, শত্রু পরাস্ত হলেও তাকে যথোচিত মর্যাদা সহকারে স্বদেশে প্রেরণ করতে হবে। কিন্তু মুসলমান বিজেতারা হিন্দুরাজাদেরকে দেখতেন অন্য দৃষ্টিতে; একবার আয়ত্তের মধ্যে পেলেই তারা তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করতেন।"[১০]

পাণ্ডব ও কৌরবদের যুদ্ধনীতিতে এই ক্ষত্রিয় বিধি চালু ছিল কিন্তু সব হিন্দু রাজা ও মুসলিম রাজারা সেই ক্ষত্রিয় নীতি মেনে যুদ্ধ করতেন না। অন্যায়ভাবে বীর যোদ্ধাকে আক্রমণের অনেক নজির রয়েছে মহাভারতে। তবে মহাভারতের শেষে শ্রীমদ্ভাগবদ গীতাতে কৃষ্ণ কংসকে পরাস্ত করলেও কখনো কংসের সিংহাসন অধিকার করতে চাননি। কৃষ্ণের এই আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজাদের বীর আচরণ ও কর্তব্যকে স্মরণ করায়। রাজত্ব ও সিংহাসন কোনো কিছুতেই কৃষ্ণের কোনো আসক্তি ছিল না। কর্তব্য পালনের জন্যই কেবল কৃষ্ণের এই যুদ্ধের পরাক্রম। মানুষকে শত্রুর হাত থেকে মুক্তির জন্যই কৃষ্ণের আবির্ভাব। আর সেই কাজে হিন্দু রাজার প্রতীকী চরিত্র হিসেবে কৃষ্ণ আদর্শ মানুষ প্রাচীন মানব সমাজের ইতিহাসের ধারায়। মুসলিম রাজারা কতখানি নিষ্ঠুর ও অমানবিক ছিল তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন বিবেকানন্দ। হিন্দু রাজাদের ত্যাগ, মানবিক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় পাই তা মুসলিম বিজেতাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। মুসলিম বিজেতা রাজাদের ভোগবাসনা ও হত্যা করার মানসিকতা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশিত করে। বিবেকানন্দ তাঁর 'হিন্দু' নামক প্রবন্ধে হিন্দু জাতির উৎকৃষ্টতার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন –

> "জগতে যত জাতি আছে তাহার মধ্যে হিন্দুই সর্বাপেক্ষা পরধর্মসহিষ্ণু। ভারতে মুসলিমরাই প্রথমে পরধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল। হিন্দুদের সকল দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও তাহারা নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতায় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বহু ঊর্ধ্বে; আর তাহার নিঃস্বার্থ সন্তানগণের যথাযোগ্য যত্ন, চেষ্টা ও উদ্যমের দ্বারা পাশ্চাত্যের কর্মৈষণা ও তেজস্বিতার কিছু উপাদান হিন্দুদের শান্ত গুণাবলীর সহিত মিশ্রিত করিলে - এ যাবৎ পৃথিবীতে যত প্রকার মানুষ দেখা গিয়েছে তদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ধরনের মানুষ আবির্ভূত হইবে।"[১১]

সেই প্রাচীনযুগে অস্ত্রবিদ্যা যে কেবল ধনুঃশর নিক্ষেপ নয় তা স্পষ্ট হয়েছে মহাকাব্য মহাভারতের মধ্যে। এই মহাকাব্যে ধনুবিদ্যার পাশাপাশি মন্ত্রশক্তি ও ধ্যানশক্তির অনুশীলনের দৃষ্টান্ত মেলে। এবং এই শক্তির দ্বারা একজন ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ শত্রুর সঙ্গে একাই লড়াই করতে পারতো। একটি মাত্র বাণ নিক্ষেপ করলে তার মধ্যে থেকে আরো সহস্র বজ্র নিক্ষিপ্ত হত। এই দৈবীমায়ার আশ্চর্য ক্ষমতা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের উক্তি –

> "রামায়ণ ও মহাভারত – এ দুটো মহাকাব্যের মধ্যে আমরা একটা অদ্ভূত ব্যাপার লক্ষ্য করি যে, সেখানে যে সব মন্ত্রপূতঃ বাণ ও অস্ত্রাদি নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল তা আমাদের আধুনিক কামান এবং দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কামান নামক যুদ্ধাস্ত্রটি বহু প্রাচীন; চীনদেশীয়রা এবং ভারতীয়রা এই অস্ত্রের ব্যবহার জানতেন। লৌহনলে প্রস্তুত এই অত্যাশ্চর্য অস্ত্রটি নগর প্রাকারে অগণিত সংখ্যায় সজ্জিত করে রাখা হত এবং প্রয়োজন মত তার মধ্যে বারুদ ও গোলা ভর্তি করে শত শত শত্রু নিধন করা হোত।"[১২]

প্রাচীন যুগে এই ধরণের মায়াবাণের সাহায্যে রাজারা যুদ্ধ করতেন। একজন যোদ্ধা লক্ষ লক্ষ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করত। তাদের রণকৌশলের মধ্যে ছিল পদাতিক সৈন্য, অশ্বারোহী সৈন্য, হস্তীবাহিনী ও রথি বাহিনী। এই চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে প্রাচীনকালে গঠিত হতো সেনাদল। এই সেনাদল নিয়ে পাণ্ডবপক্ষ কৌরবদের সঙ্গে লড়াই করত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়েই কৌরব দুর্যোধনদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 551 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিবেকানন্দের মতে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি হল শ্রীমদ্ভগবদ গীতা যেখানে উচ্চতম দর্শনতত্ত্বের আলোচনা রয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল তারই সংকলন গ্রন্থ এই 'শ্রীমদ্ভগবদ গীতা'। আমেরিকায় এই গ্রন্থের প্রভাব পড়েছে বলে বিবেকানন্দ মনে করেন। আমেরিকার লেখক এমার্সনের লেখার মূল প্রেরণার সূত্র অনুসন্ধানে গীতার প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। কার্লাইলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় এমার্সন তাকে গীতা উপহার দেন। তাছাড়া এদেশে যে কনকর্ড আন্দোলন হয়েছিল তারও মূলে ছিল এই গীতাই। আমেরিকায় যেসব উদারনৈতিক আন্দোলন হয়েছিল তার জন্য এই কনকর্ড গৌষ্ঠীর সমগ্র দেশ বিশেষভাবে ঋণী। তাই বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসীকে গীতা পাঠ করার জন্য অনুরোধ করেন।

বিবেকানন্দ মনে করেন গীতার প্রধান চরিত্র হল শ্রীকৃষ্ণ। আমেরিকাবাসী যেমন নেজারথীয় যিশুকে কেবলমাত্র ঈশ্বরের অবতাররূপে মানে হিন্দুরা সেক্ষেত্রে অনেককেই ঈশ্বরের অবতাররূপে মেনে চলে। হিন্দুদের মতানুযায়ী কেবলমাত্র একজন নয় অনেক মহামানব যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন দুষ্টের দমন করে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কৃষ্ণভক্তগণ মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ হলেন অবতারের পূর্ণ বিগ্রহ। বুদ্ধ থেকে শুরু করে অন্যান্য অবতারেরা গৃহী মানুষদের প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখাননি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে, রাজারূপে ও পিতারূপে সমস্ত ভূমিকায় মহানুভবতার কর্ম পালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের উক্তি –

> "কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দেখুন! পুত্ররূপে, রাজারূপে, পিতারূপে - সর্ব ভূমিকায় তিনি ছিলেন মহান; এবং যে বাণী প্রচার করেছেন, সেই বাণীর সাধনাই করে গেছেন জীবনব্যাপী, শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যিনি প্রভূত পরিমাণ কর্মের মধ্যেও স্নিগ্ধ প্রশান্তি এবং মহাশক্তির মধ্যেও প্রবল কর্মবেগ অনুভব করে তিনিই জীবনের গূঢ় তত্ত্ব অবগত হয়েছেন।"[১৩]

কর্ম বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ ও পথের সঙ্গে বিবেকানন্দ নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা ও বাণীর মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। কৃষ্ণের মতাদর্শের সঙ্গে স্বামীজি নিজের মতাদর্শের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই কৃষ্ণের পথকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কর্ম যাপনে অনাশক্তির পথ অনুসরণ করার কথা বলেন কৃষ্ণ। স্বামী বিবেকানন্দও সারাজীবন দেশবাসীকে সেই অনাশক্তির পথ অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণের অভিমত –

> "সমস্ত কর্মই আপনারা করুন কিন্তু কর্মে আসক্ত হবেন না; কর্মের সঙ্গে নিজেদের একাকার করে তুলবেন না।"[১৪]

আসক্তহীন কর্মই জীবনের সাফল্যকে সুনিশ্চিত করে। সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের জন্য আসক্তিহীন কর্মই একমাত্র পাথেয়। কর্মের সঙ্গে নিজেকে একাকার না করে কর্মকে উদ্দেশ্য রেখেই এগোনোর কথা বলেন কৃষ্ণ। শুধু কর্ম নয়, অর্থ সম্বন্ধেও কৃষ্ণের চিন্তাধারা ও মতাদর্শ সাধারণ মানুষের মেনে চলা উচিত বলে মনে করেন বিবেকানন্দ। কৃষ্ণের বক্তব্য –

> "অর্থ এক অতিপ্রাপ্তব্য বস্তু, তা উপার্জন করেই আনতে হয়; তার জন্য চেষ্টা করুন, পরিশ্রম করুন, কিন্তু অর্থের প্রতি আসক্তি যেন না জন্মায়। স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, আত্মজন, নাম, যশ ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে অনুরূপ ভাবটুকু রক্ষণীয়। সেগুলোকে পরিহার করার প্রয়োজন নেই, পরিহার করুন কেবলমাত্র আসক্তি। আসক্তি কেবল একটি মাত্র বিষয়েই তা হল ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন আর কোনো কিছুতেই কদাচ আসক্তি নয়।"[১৫]

কর্ম-অর্থ-নাম-যশ ইত্যাদির জন্য চেষ্টা করা দরকার। পরিশ্রম করা দরকার এগুলো পাওয়ার জন্য কিন্তু এগুলোর জন্য মোহ বা আসক্তি জীবনের জন্য হানিকর। ঈশ্বর ভিন্ন কোনো কিছুতেই আসক্তি না থাকাই শ্রেয় বলে মনে করেন কৃষ্ণ। শুধু কৃষ্ণ নন স্বামীজিও একই পথের দিশারী। তিনিও স্বার্থত্যাগ করেছেন পরের জন্য। দরিদ্রকে ও ক্ষুধিতকে অন্ন এবং বস্ত্র তুলে দিতে তিনি বহু চেষ্টা করেছেন কিন্তু তার এই চেষ্টার মধ্যে কোনো আসক্তি ছিল না। আসক্তিহীন এই কর্মের জন্য তিনি পৃথিবীতে আজও অম্লান হয়ে আছেন। মানুষের জন্য কর্ম করার কথা বলেন কৃষ্ণ। মানুষকে ভালোবাসে মানুষের হিতসাধন করার কথা বলেছেন কৃষ্ণ। প্রয়োজনে মানুষের জন্য আত্মবিসর্জন একমাত্র সার্থক ও আদর্শ পথ। স্বামীজিও কৃষ্ণের বলা পথ ও বাণীকে নিজের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছিলেন। স্বামীজি তার গোটা জীবনে যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 551 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মানুষের কল্যাণের জন্য নিজেকে উজার করে দিয়েছিলেন। মানুষের জন্য তার জীবন ছিল বলিপ্রদত্ত। নিজের জীবন দিয়ে তিনি মানুষকে ভালোবেসেছেন। তাঁর কর্মের মধ্যে যে উদ্দীপনা ও প্রচেষ্টা ছিল তা সাধারণ মানুষকেও উজ্জীবিত করেছে অবিরত। স্বামীজি কৃষ্ণের আদর্শকে নিজের জীবনের আদর্শ পথ বলে ভেবেছিলেন। মানুষকে ভালোবেসে তিনি দেশের হিতসাধন করেছেন।

কৃষ্ণের জীবনের কিছু কিছু অংশের সঙ্গে নেজারথীয় যিশুর জীবনের সাদৃশ্য দেখিয়ে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের তথা প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনকে সুনিশ্চিত করতে চেয়েছেন বিবেকানন্দ। চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গে এক গভীর আত্মিক যোগ। যেখানে কোনো হিংসা ও হানাহানি থাকবে না। সাম্রাজ্য বিস্তারের বিপুল চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। থাকবে শুধু পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসার অটুট বন্ধন। যে ভালোবাসায় দুই দেশ পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করবে প্রজ্ঞা- প্রযুক্তি-চিন্তা-ধারণা ও মতাদর্শ। স্বামীজির লক্ষ্য ছিল সম্প্রীতি। যেখানে দেশ-কাল-জাতির ভেদাভেদ মুছে গিয়ে ঔপনিবেশিক আকাঙ্ক্ষা দূরে সরে গিয়ে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে। যে ভ্রাতৃত্বে থাকবে সংস্কৃতি ও জ্ঞানের বিনিময়। স্বামীজির উদ্দেশ্য ছিল দেশ ভিন্ন হলে ও ঈশ্বর তাদের এক। মানুষ ভিন্ন হলেও তাদের সাধনার লক্ষ্য ও বস্তু এক। দেশ ভিন্ন হলেও তাদের উপাসনার মাধ্যম এক। এই ঐক্য স্থাপনের দ্বারা ভারতকে সমগ্র পৃথিবীর কাছে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বিবেকানন্দ। ভারতের ত্যাগের দর্শন ও গীতায় উল্লেখিত আসক্তিহীন কর্মের সাধনা অন্য দেশগুলির কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠুক এটাই চেয়েছিলেন বিবেকানন্দ। কৃষ্ণের জন্মগ্রহণের ক্ষণ এবং যিশুর জন্মগ্রহণের মুহূর্ত অভিন্ন ছিল। কারাগারেই জন্মগ্রহণ করেন কৃষ্ণ। তার জন্মক্ষণে এক বিচিত্র আলোকে আলোকময় হয়ে উঠেছিল সমস্ত কারাগার। সেই মুহূর্তে নবজাতক শিশু বলে উঠেছিল –

> "আমি এই জগতের আলো; জগতের মঙ্গলের জন্যই জন্ম নিয়েছি।"[১৬]

এই মহামানবের জন্মের কথা ঋষিরা জানতে পেরে তাকে পাদ্য অর্ঘ নিবেদন করতে এসেছিলেন। এখানে যিশুর জন্মের মুহূর্তের সঙ্গে কৃষ্ণের জন্মের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। রাখাল রাজা রূপে কৃষ্ণকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং গোধনের সঙ্গে প্রতীকীভাবে যুক্ত করা হয়েছে। এই সকল সাদৃশ্য বা মিল কৃষ্ণ ও যীশুকে একই ঈশ্বরের দুই রূপ বলে মনে করায়। কৃষ্ণ কংসকে পরাজিত করেছেন কিন্তু কংসের সিংহাসন অধিকার করেননি। কেবল কর্তব্য পালন করেছেন মাত্র। কৃষ্ণ অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে অন্যদের রাজ্য পাইয়ে দিয়েছিলেন। ভীষ্ম ও তাই করেছিলেন। ভীষ্ম কর্তৃত্ব ভোগ করেছিলেন কিন্তু কৃষ্ণের ভোগ কর্তৃত্ব শূন্য ছিল। কৃষ্ণ কখনো কাঁদেননি তিনি নিষ্কাম ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইরাবতী কার্বের 'যুগান্ত' গ্রন্থে কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বলা উক্তিটি ব্যক্ত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন –

> "এই জন্যই মহাভারতের কৃষ্ণকে ছোঁওয়া যায় না। হৃদয়ে স্পর্শ করে না। তিনি ভালোবেসেছেন, প্রতিশোধ নিয়েছেন তিনি আনন্দে নেঁচেছেন, পাণ্ডবরা রাজ্য হারালে তখন দুঃখে ছটফট করেছেন। কিন্তু এসব করেও তিনি লিপ্ত হননি। সব মানবিক কষ্ট, মানবিক সুখ, মানবিক আবেগ তাঁর চরিত্রে ছিল, তবুও এই অসাধারণ অসংপৃক্ততার ফলে তাঁকে সাকার করে ধরা যায় না। তিনি গীতা শুধু বলেননি, তিনি গীতাকে জীবনের মধ্যে দিয়ে পালন করে গেছেন।"[১৭]

স্বামীজি বলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপ্তির পরেও মহাযোদ্ধা কৌরব পিতামহ ভীষ্ম জীবিত ছিলেন। আঠারো দিনের যুদ্ধে দশ দিন যুদ্ধ করার পর মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে নানা উপদেশ দেন। এই উপদেশগুলির মধ্যে ছিল রাজা ও চতুর্বর্ণেরে কর্তব্য, সাংখ্য দর্শন, যোগ দর্শন, মানব জীবনে চতুরাশ্রম, বিবাহ ও উপঢৌকন বিধি। তাঁর সমস্ত উপদেশ ছিল প্রাচীন ঋষিগণ কথিত এবং নির্দেশিত। ভীষ্ম প্রদত্ত এই উপদেশগুলি সমগ্র মহাভারতের প্রায় এক চতুর্থাংশের মত এবং এগুলোই পরবর্তীকালে হিন্দু আইন এবং নৈতিক বিধানের অমূল্য উপাদানরূপে বিবেচিত হয়েছে।

কৃষ্ণের দেহত্যাগে যদুবংশ ধ্বংস হল। এই মৃত্যুর দুঃসংবাদে রাজা যুধিষ্ঠির ও পাণ্ডব ভ্রাতৃগণ শোকে নিমগ্ন হলেন এবং উপলব্ধি করলেন তাঁদের এবার সংসার ত্যাগ করা উচিত। এই কারণে তারা হিমালয়ের অভিমুখে মহাপ্রস্থানের যাত্রা করলেন। বিবেকানন্দের মতে 'মহাপ্রস্থান হল এক বিচিত্র ধরনের সন্ন্যাস। প্রাচীন যুগের প্রথা ছিল যে, রাজন্যবর্গ বৃদ্ধ হলে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 551 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করবে। রাজারা তাই সংসার ধর্মের শেষে সন্ন্যাসী হতেন। হিন্দু ধর্মে সন্ন্যাস গ্রহণ ছিল প্রধান লক্ষ্য। এ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ তার 'হিন্দু' নামক প্রবন্ধে বলেছেন –

> "তোমরা সকলে জানো, সন্ন্যাস-আশ্রমই হিন্দু জীবনের চরম লক্ষ্য। আমাদের শাস্ত্র সকলকে সন্ন্যাসী হইতে আদেশ করিতেছেন। সংসারের সুখসমুদয় ভোগ করিয়া প্রত্যেক হিন্দুকেই জীবনের শেষভাগে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। যে তাহা না করে, সে হিন্দু নয়; তাহার নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই, সে শাস্ত্র অমান্য করে। যখন ভোগের দ্বারা প্রাণে প্রাণে বুঝিবে যে সংসার অসার তখন তোমাকে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। আমরা জানি ইহাই হিন্দুর আদর্শ।"[১৮]

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী সন্ন্যাস জীবন বেছে নেন। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর রাজা যুধিষ্ঠির অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসিয়ে, সিংহাসন ত্যাগ করে সাধ্বী স্ত্রী দ্রৌপদী, মাতা কুন্তী এবং ভাইদের সঙ্গে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে অরণ্যে চলে গিয়েছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রকে মেনে এবং জীবনের ভোগ যখন বিতৃষ্ণার কারণ হয়ে আসে তখন মুক্তির জন্য সন্ন্যাস জীবন ছিল সকল হিন্দুর কাঙ্ক্ষিত পথ। সেই পথই কৌরব ও পাণ্ডবরা বেছে নিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরদের মহাপ্রস্থান সেই সন্ন্যাস গ্রহণের এক বিচিত্র রূপ। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এলে সে যুগের মানুষ হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করতেন এবং যতক্ষন না দেহের পতন ঘটত ততক্ষণ অবধি সবকিছু পরিত্যাগ করে পথ চলতেন এবং ঈশ্বরের নাম করে যেতেন। দেবতা ও ঋষিদের আদেশ অনুসরণ করে যুধিষ্ঠির স্বর্গে যাবার সংকল্প স্থির করলেন। স্বর্গে পৌঁছাতে গেলে হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মেরু পর্বতে উঠতে হবে। এই মেরুর শীর্ষে রয়েছে স্বর্গ। মহাপ্রস্থানের পথে চার ভাই ও দ্রৌপদীর মৃত্যু হয়। কেবল যুধিষ্ঠির ছিলেন জীবিত আর তার সঙ্গে একটি মনুষ্যেতর প্রাণী কুকুর। দেবরাজ ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিলেন কিন্তু যুধিষ্ঠির সেই কুকুরটিকে ছাড়া স্বর্গে যেতে রাজি হননি। স্বর্গসুখলাভের জন্য তিনি কখনো ব্যাকুল হননি। দয়া, মায়া ও করুণা প্রভৃতি মানবিকগুণ তার মধ্যে স্পষ্ট। আশ্রয়প্রার্থী কুকুরকে ছেড়ে তিনি স্বর্গে যেতে চাননি। নিজের স্বর্গাধিকার কুকুরের নরকাধিকারের সঙ্গে বিনিময় করতেও তিনি রাজী ছিলেন। কুকুরকে স্বর্গবাসের সুখ দিয়ে নিজে নরক এর যন্ত্রণা ভোগ করতে চেয়েছিলেন। এমন নিঃস্বার্থ মানুষ পৃথিবীতে বিরল। আশ্রিত কুকুরটিকে নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি তার প্রার্থনা ছিল-

> "একে সঙ্গে নিতে না পারলে আমিও স্বর্গে যাব না। আমার কাছে যে আশ্রয় নিয়েছে তাকে আমৃত্যু নিজের আশ্রয়েই রাখব। কখনোই পরিত্যাগ করতে পারব না। ন্যায়নীতি থেকে কখনো ভ্রষ্ট হব না। দেবতাদের অনুরোধ অথবা স্বর্গসুখলাভের জন্যও নয়।"[১৯]

বিবেকানন্দ মহাভারতের যুধিষ্ঠিরকে সামনে রেখে আমাদের চরিত্রকে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। মানবিক মূল্যবোধ কীভাবে গড়ে উঠতে পারে তার সার্থক উদাহরণ যুধিষ্ঠির। আশ্রিত ব্যক্তির প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হওয়া উচিত তার যথার্থ উদাহরণ যুধিষ্ঠির। নিজের সুখ চাওয়ার থেকে পরের সুখ চাওয়ার মধ্যে যে কী পরিমাণ নিঃস্বার্থপরতার ইঙ্গিত আছে তা স্পষ্ট হয়েছে যুধিষ্ঠিরের এই স্বর্গসুখলাভের ইচ্ছে ও বক্তব্য থেকে। ধর্ম বা ন্যায়ের পথে চলতে গেলে কতখানি আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগ করতে হয় তা কুকুরের প্রতি তার সহমর্মিতা ও সহানুভূতি থেকে স্পষ্ট হয়েছে। তাই মহাভারতের যুধিষ্ঠির ন্যায়নীতির চিরন্তন প্রতীক। এই ন্যায় তাকে স্বর্গে শশরীরে যাবার অধিকারকে সুনিশ্চিত করেছিল। এক রক্তে মাংসের মানুষ দিব্যদেহ ধারণ করে ন্যায়ের কারণে পৃথিবীতে উজ্জ্বল ও স্বতন্ত্র হয়ে চিরদিন বেঁচে থাকলেন। তার এই অমরত্ব ধর্ম বা ন্যায়ের অমরত্বকে প্রতিবিম্বিত করবে চিরকাল। সামান্য কুকুরের জন্য যে নিজের জীবনের পূণ্যফল ত্যাগ করে নরকে যেতে প্রস্তুত হয়েছে তার প্রতি সেই কুকুররূপী ধর্মরাজের বক্তব্য –

> "আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি মহারাজ এই দেখে যে আপনার মত এমন নিঃস্বার্থ মানুষও হতে পারে। হে রাজাধিরাজ আপনার জন্ম সার্থক! হে ভরতর্ষভ, সর্বজীবে দয়ারূপে আপনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।"[২০]

যুধিষ্ঠিরের মতো জীবের প্রতি নিঃস্বার্থে দয়াই বিবেকানন্দের কাছে পরোপকারিতার আদর্শ পথ হিসেবে চিহ্নিত। এই দয়া-মায়া ভরা ভালোবাসাই মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যুগে যুগে কালে কালে। তাই স্বামীজি বলেছেন মহাভারতের বিশাল আখ্যানভাগ এক চিরসত্য তত্ত্বের আবিষ্কার করেছে। আবিষ্কৃত তত্ত্বটি হল –

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 551 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "পুণ্যের কাছে পাপের পরাভব।"[২১]

এই তাত্ত্বিক উক্তিটি পৃথিবীর সমগ্র দেশ-রাষ্ট্র-সমাজের কাছে অতি মূল্যবান পাঠ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। দেশকাল অতিক্রম করেও এই সত্য চিরদিন অটুট থাকবে মানুষের মনুষ্যত্বের কাছে।

সবশেষে মহাভারতের চরিত্রগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন স্বামীজী। তিনি বলেছেন ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে ধর্মভীরুতা, পুত্রস্নেহ ও এবং ন্যায়নীতির অন্তর্দ্বন্দ্ব। পিতামহ ভীষ্মের মধ্যে রয়েছে সমুহান চারিত্র্য, রাজা যুধিষ্ঠিরের মধ্যে রয়েছে ন্যায়নিষ্ঠা আর চার পাণ্ডবভ্রাতাদের মধ্যে রয়েছে জ্যেষ্ঠের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য এবং বীর্যবত্তা। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে রয়েছে অতিমানবিক প্রজ্ঞা। এই সকল চারিত্রিক গুণ নিয়ে মহাকাব্য মহাভারত হয়ে উঠেছে হিন্দু মানস ও চিন্তাধারার নৈতিকতা ও ন্যায়বোধের ভিত্তি স্বরূপ। তিনি আরো বলেছেন –

> "বস্তুত রামায়ণ ও মহাভারত প্রাচীন ভারতীয় জীবনচর্যা ও প্রজ্ঞার বিশ্বকোষস্বরূপ হয়ে আছে এবং উভয়ের মধ্যে মানব সভ্যতার যে আদর্শের চিত্র দেখি তা আজকের মানুষের পক্ষেও একান্ত কাম্য।"[২২]

প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞা ও চেতনার কাছে বর্তমান ভারত অনেকাংশে ঋণী। এই বর্তমান ও আগামী ভারতের মানুষ মহাভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে সহজেই তাদের জীবনের জন্য গ্রহণ করবে এবং প্রতিটিক্ষেত্রে যে প্রয়োগ করবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রামায়ণ–মহাভারতের আদর্শকে আজকের মানুষের অনুকরণ এবং অনুসরণ করা উচিত বলে বিবেকানন্দ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন।

> "প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি মহাভারতের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতিও প্রতিটি পর্বের মাঝে রয়েছে। মহাভারতের শান্তি পর্বের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় - রাজকোষের চেয়ে দণ্ডকে বড় বলা যাবে না অথবা দণ্ডের চেয়ে রাজকোষেরো গুরুত্ব বেশি বলে স্থাপন করা যাবে না। শত্রুরাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধের সময় রাজার কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অঙ্গ হল দণ্ড। সেনা, সেনাপতি, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি – এগুলিই দণ্ডের উপাদান এবং যুদ্ধের সময় এগুলিরই প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে এই দণ্ডনীতির লড়াই প্রাচীন ভারতীয় অস্ত্রবিদ্যা ও যুদ্ধনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবকে নির্মাণ করেছে।"[২৩]

আখ্যান মহাভারতের আড়ালে প্রাচীন ভারতীয় জীবনবৃত্তের যে সম্পূর্ণ রূপতাত্ত্বিক অবয়ব দেখার সুযোগ আমরা পেলাম তা স্বামী বিবেকানন্দের জন্যই। তিনি তার গভীর দৃষ্টিশক্তি ও অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে মহাভারতের গঠন ও আখ্যানকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। যার জন্য প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষ আমাদের সামনে ধরা দিয়েছে। অধরা ও অলিখিত সেই প্রাচীন সভ্যতা, তার প্রাচীনত্ব, তার নিয়ম-নীতি, তার বর্ণ ব্যবস্থা, যুদ্ধে যুদ্ধবাজদের নীতি-দুর্নীতির কলতান, তার গার্হস্থ্য জীবন ও সমাজ জীবন আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারলাম স্বামীজীর পৌরহিত্যে। আমেরিকার পাসাডেনায় স্বামীজির ভাষণে হিন্দুত্ববাদের ধারণা ভারতের সমগ্র হিন্দু জাতির কল্যাণ ও উত্থানকে সুনিশ্চিত করেছে এবং একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হিন্দুত্বকে নবভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। স্বামীজির লেখনীর গুণে সাবিত্রী-সত্যবানের প্রেমের কাহিনি আধুনিক কালেও প্রাসঙ্গিক। সাবিত্রীর মতই আধুনিক কালের সকল নারীকে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের অধিকারিণী করে তুলতে চেয়েছেন বিবেকানন্দ। মৃত্যুকে ছাপিয়ে যেন প্রেমচেতনার সর্বকালীন ও সর্বজনীন প্রতীক হয়ে উঠেছে সাবিত্রী। মাতা কুন্তীর আদেশকে মান্যতা দিতে গিয়ে কীভাবে প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান আধুনিক যুগ পর্যন্ত মাতৃ আদেশ চিরন্তন সত্য হিসেবে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আসন পেয়েছে তা স্বামীজির কলমেই স্পষ্ট হয়েছে। ধার্মিক যুধিষ্ঠিরের ন্যায়-নিষ্ঠা তথা নৈতিকতা এবং সর্বজ্ঞ কৃষ্ণের আসক্তিহীন কর্ম যাপন এই একবিংশেও প্রাসঙ্গিক। তাই স্বামীজির প্রত্যয় মহাভারতের এই কাহিনি ও চরিত্রগুলি আবেদনে এবং আস্বাদনে সর্বকালে ও সর্বমানবে প্রাসঙ্গিক ও জীবন্ত হয়ে উঠবে।

Reference:

১. স্বামী বিবেকানন্দ, মহাভারত, সম্পাদক কাঞ্চন বসু, বিবেকানন্দ সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ১৯৯৩, পৃ. ৯৫

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 551 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২. স্বামী বিবেকানন্দ, মহাভারত, সম্পাদক কাঞ্চন বসু, বিবেকানন্দ সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ১৯৯৩, পৃ. ৯৬
৩. বসু প্রতিভা, মহাভারতের মহারণ্যে, বিকল্প প্রকাশনী, বিধান সরণি, কল-৭০০০৭৩, অষ্টম সংস্করণ- আগস্ট-২০১৬, পৃ. ৮৯
৪. স্বামী বিবেকানন্দ, মহাভারত, সম্পাদক কাঞ্চন বসু, বিবেকানন্দ সমগ্র, ঐ, পৃ. ৯৭
৫. ঐ, পৃ. ৯৭
৬. ঐ, পৃ. ৯৮
৭. ঐ, পৃ. ১০২
৮. ঐ, পৃ. ১০৩
৯. ঐ, পৃ. ১০৫
১০. ঐ, পৃ. ১০৫
১১. স্বামী বিবেকানন্দ, হিন্দুত্ব, সম্পাদক স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সঞ্চয়ন, উদ্বোধন কার্যালয় ১৯৬৫, পৃ. ৯৮
১২. স্বামী বিবেকানন্দ, মহাভারত, সম্পাদক কাঞ্চন বসু, বিবেকানন্দ সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
১৩. ঐ, পৃ. ১০৬
১৪. ঐ, পৃ. ১০৬
১৫. ঐ, পৃ. ১০৭-১০৮
১৬. ঐ, পৃ. ১০৭
১৭. কার্বে ইরাবতী, যুগান্ত, অনুবাদ অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ. ১০৮
১৮. স্বামী বিবেকানন্দ, হিন্দুত্ব, সম্পাদক স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সঞ্চয়ন, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬৫, পৃ. ৯৭
১৯. স্বামী বিবেকানন্দ, মহাভারত, সম্পাদক কাঞ্চন বসু, বিবেকানন্দ সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ১৯৯৩, পৃ. ১০৯
২০. ঐ, পৃ. ১০৯
২১. ঐ, পৃ. ১০৯
২২. ঐ, পৃ. ১০৯
২৩. ভাদুড়ী নৃসিংহপ্রসাদ, মহাভারত : নীতি অনীতি দুর্নীতি, পত্রলেখা, ১০ বি কলেজ রো, কলকাতা-০৯, কলকাতা বইমেলা ২০১৪, পৃ. ৩৭৮-৩৭৯